আলেমগণের মধ্যে মতভেদ

কারণ এবং আমাদের অবস্থান

[বাংলা – Bengali – بنغالي]

আল্লামা শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সালেহ্ আল-উসাইমীন

অনুবাদ : আব্দুল আলীম বিন কাউসার

সম্পাদনা : আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

2011 - 1433

IslamHouse.com

﴿ الخلاف بين العلماء: أسبابه وموقفنا منه ﴾

« باللغة البنغالية »

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

ترجمة: عبد العليم بن كوثر

مراجعة: أبو بكر محمد زكريا

2011 - 1433

IslamHouse.com

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

সমস্ত প্রশাংসা আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁরই প্রশংসা করি, তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি। তাঁর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করি এবং তাঁরই নিকট তওবা করি। আমরা আল্লাহর কাছে আমাদের মনের অনিষ্ট এবং আমাদের কর্মের খারাপ পরিণতি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ যাকে পথপ্রদর্শন করেন, তার পথভ্রষ্টকারী কেউ নেই। আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন, তার পথপ্রদর্শনকারী কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, কোন প্রকার শরীক বিহীন এক আল্লাহ ছাড়া কোন হক্ব মাবুদ নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ *ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম* তাঁর বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ তাঁর উপর, তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর, সকল ছাহাবীর উপর এবং ক্বিয়ামত দিবস পর্যন্ত তাঁদের পথের পথিকগণের উপর দরূদ ও সালাম বর্ষণ করুন।

‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করার মত ভয় কর এবং তোমরা মুসলিম না হয়ে মরো না।’[1]

‘হে মানবমণ্ডলী! তোমরা তোমাদের প্রভূকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের উভয় থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন। আর সেই আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন

---

[1] সূরা আলে ইমরান ১০২।

কর, যাঁর নামের দোহাই দিয়ে তোমরা একে অপরকে তাগাদা কর এবং আত্মীয়তার সম্পর্কের বিষয়েও সতর্ক থাক। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের উপর পর্যবেক্ষক’।[2]

‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং সঠিক কথা বল; তাহলে তিনি তোমাদের কর্মকে ত্রুটিমুক্ত করবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, তারা অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে’।[3]

অতঃপর বইয়ের এই বিষয়টা অনেকের কাছে প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারে। কেউ প্রশ্ন করতে পারে, **কেন এই বিষয়টা চয়ন করা হল, অথচ শরী‘আতের অন্য এমন বিষয় আছে, যা এর চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ হতে পারত?** কিন্তু এই বিষয়টাই বিশেষ করে বর্তমান যুগে অনেকের চিন্তা-চেতনাকে ব্যস্ত রেখেছে। আমি শুধু সাধারণ মানুষের কথা বলছি না; বরং দ্বীনের জ্ঞানপিপাসু ছাত্রবৃন্দও এর অন্তর্ভুক্ত। আর এটা এ কারণে যে, প্রচার মাধ্যমগুলোতে শরী‘আতের বিধিবিধানের প্রচার ও প্রসার ব্যাপক আকারে বেড়ে গেছে এবং একজনের কথার সাথে অন্যজনের কথার অমিল বিশৃংখলার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে; বরং

---

[2]. সূরা নিসা ১।

[3]. সূরা আল-আহযাব ৭০-৭১।

অনেকের মাঝে সন্দেহের জন্ম দিয়েছে, বিশেষ করে সাধারণ জনগণ- যারা মতভেদের উৎস সম্পর্কে জানে না।

সেজন্য আমার দৃষ্টিতে মুসলিমদের নিকট উক্ত বিষয়ের যথেষ্ট গুরুত্বের কথা ভেবে আমি এ বিষয়ে আলোচনা করছি এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি।

এই উম্মতের উপর আল্লাহর বড় নেয়ামত হল এই যে, দ্বীনের মৌলিক বিষয়াদি এবং মূল উৎসগুলো নিয়ে তাদের মাঝে কোন মতভেদ নেই; বরং এমন কিছু বিষয়ে মতভেদ রয়েছে- যা মুসলিমদের প্রকৃত ঐক্যে আঘাত হানে না। আর সাধারণ এই মতভেদ হতেই হবে। মৌলিক যে বিষয়গুলো নিয়ে আমি কথা বলতে চাই, তা সংক্ষিপ্তাকারে নীচে তুলে ধরা হলঃ-

প্রথমতঃ পবিত্র কুরআন ও রাসূল *ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম*-এর সুন্নাতের বুঝ্ অনুপাতে সমস্ত মুসলিমের নিকট সুবিদিত বিষয় হল, আল্লাহ তা‘আলা মুহাম্মাদ *ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম*-কে হেদায়েত এবং সঠিক দ্বীন দিয়ে প্রেরণ করেছেন। এ কথার অর্থ এই যে, রাসূল *ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম* এই দ্বীনকে সুস্পষ্ট ও পরিপূর্ণভাবে বর্ণনা করে গেছেন- যার পরে আর বর্ণনার প্রয়োজন নেই। কেননা হেদায়েতের অবস্থান যাবতীয় পথভ্রষ্টতার বিপরীতে আর সঠিক দ্বীনের অবস্থান যাবতীয় বাতিল দ্বীনের বিপরীতে, যে দ্বীনগুলোতে আল্লাহ সন্তুষ্ট নন। আর রাসূল *ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম* এই হেদায়েত এবং সঠিক দ্বীন

নিয়েই প্রেরিত হয়েছেন। রাসূল *ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম*-এর যুগে মতপার্থক্য হলে লোকজন তাঁর কাছেই ফিরে যেতেন। ফলে তিনি তাঁদের মাঝে ফায়সালা করতেন এবং তাঁদেরকে হক্ব বলে দিতেন- চাই সেই মতানৈক্য আল্লাহর কালাম নিয়েই হোক বা আল্লাহ প্রদত্ত এমন কোন বিধিবিধান নিয়েই হোক- যা এখনও অবতীর্ণ হয়নি। তবে পরবর্তীতে সেই বিধান বর্ণনা করে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। পবিত্র কুরআনের কত আয়াতেই না আমরা পড়ে থাকি **'তারা আপনাকে অমুক বিষয়ে জিজ্ঞেস করে'**। তখন আল্লাহ পরিপূর্ণ জওয়াব নিয়ে তার নবী *ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম*-এর ডাকে সাড়া দেন এবং তা মানুষের নিকট পৌঁছে দিতে তাঁকে নির্দেশ করেন। যেমনঃ আল্লাহ বলেন, 'তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে, তাদের জন্য কি কি হালাল করা হয়েছে? তুমি বলে দাও: পবিত্র জিনিসগুলো তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। তোমরা যে সমস্ত পশু-পাখিকে শিকার করা শিক্ষা দিয়েছ- যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, তারা যা শিকার করে আনে, তা তোমরা খাও এবং এগুলোকে শিকারের জন্য পাঠানোর সময় 'বিসমিল্লাহ' বলো। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ হিসাব গ্রহণে তৎপর'।[4]

[4]. সূরা আল–মায়েদাহ ৪।

‘তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে, তারা কি ব্যয় করবে? তুমি বল, তোমাদের উদ্বৃত্ত জিনিস। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য নিদর্শনাবলী বর্ণনা করেন- যেন তোমরা চিন্তা কর’।[5]

‘হে নবী! লোকেরা তোমাকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে? তুমি বলে দাও, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য। অতএব, তোমরা এ ব্যাপারে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং তোমাদের নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্ক সঠিকভাবে গড়ে নাও। আর যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক, তাহলে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর’।[6]

‘তারা তোমাকে নতুন চাঁদসমূহ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে? তুমি বল, এগুলো হচ্ছে জনসমাজের উপকারের জন্য এবং হজ্জের জন্য সময় নিরূপক। আর তোমরা যে পশ্চাৎদিক দিয়ে গৃহে সমাগত হও এটা পূণ্যের কাজ নয়; বরং পূণ্যের কাজ হল, যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করল। তোমরা গৃহসমূহের দরজা দিয়ে প্রবেশ কর এবং আল্লাহকে ভয় কর- যাতে করে তোমরা সফলকাম হতে পার’।[7]

‘তারা তোমাকে নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছে? তুমি বল, তাতে যুদ্ধ করা অতীব অন্যায়। কিন্তু আল্লাহর

---

[5]. সূরা আল–বাক্বারাহ ২১৯।

[6] . সূরা আল-আনফাল ১।

[7]. সূরা আল-বাক্বারাহ ১৮৯।

পথ ও পবিত্র মসজিদ হতে মানুষকে প্রতিরোধ করা ও তার মধ্য থেকে তার অধিবাসীদেরকে বহিস্কার করা আল্লাহর নিকট আরো গুরুতর অপরাধ। হত্যা অপেক্ষা ফেৎনা-ফাসাদ গুরুতর। আর তারা যদি সক্ষম হয়, তাহলে তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন থেকে ফিরাতে না পারা পর্যন্ত নিবৃত্ত হবে না। তবে তোমাদের মধ্যকার কেউ যদি নিজের দ্বীন থেকে ফিরে যায় এবং ঐ কাফির অবস্থাতেই তার মৃত্যু ঘটে, তাহলে তাদের দুনিয়া ও আখেরাত সংক্রান্ত সমস্ত আমলই ব্যর্থ হয়ে যাবে। আর তারাই হল জাহান্নামবাসী এবং তারই মধ্যে তারা চিরকাল অবস্থান করবে'।[৪]

এ জাতীয় আরো বহু আয়াত রয়েছে- যেগুলোতে এরকম প্রশ্নোত্তর উদ্ধৃত হয়েছে।

কিন্তু রাসূল *ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম*-এর মৃত্যুর পর উম্মতে মুহাম্মাদী শরী'আতের এমন সব বিধিবিধানের ক্ষেত্রে মতভেদ করেছে- যা শরী'আতের মৌলিক বিষয়াবলীতে এবং মূল উৎসগুলোতে আঘাত হানে না।

তবে [আঘাত হানুক বা না হানুক] তা এক ধরনের মতভেদ- যার কারণগুলো আমরা অচিরেই বর্ণনা করব ইনশাআল্লাহ। আমরা নিশ্চিতভাবে জানি যে, যাঁদের ইলমে, আমানতদারিতায় এবং দ্বীনদারিতায় নির্ভর করা যায়- এমন সব

---

[৪]. সূরা আল-বাক্বারাহ ২১৭।

আলেমের কাউকে পাওয়া যাবে না, যিনি ইচ্ছাকৃতভাবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাতের নির্দেশিত বিষয়ের বিরোধিতা করেন। কেননা যিনি ইলম এবং দ্বীনদারিতার বিশেষণে বিশেষিত হয়েছেন, তাঁর লক্ষ্যই হচ্ছে 'হক্ব'। আর যার লক্ষ্য হক্ব, আল্লাহ তার জন্য তা সহজ করে দেন। ঐ শুনুন আল্লাহর ঘোষণা, 'আর আমি কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি। অতএব, উপদেশগ্রহণকারী কেউ আছে কি?'[9]

'সুতরাং কেউ দান করলে, তাকওয়া অবলম্বন করলে এবং সৎবিষয়কে সত্য জ্ঞান করলে অচিরেই আমি তার জন্য সহজ পথকে সুগম করে দেব'।[10]

তবে হ্যাঁ, ঐ জাতীয় আলেমের আল্লাহর বিধিবিধানের ক্ষেত্রে ভুলক্রটি হতে পারে, কিন্তু শরী'আতের মৌলিক বিষয়ে নয়- যে দিকে আমরা একটু আগে ইঙ্গিত করেছি। আর এই ভুলক্রটি অবশ্যম্ভাবী একটা বিষয়- যা ঘটবেই। কেননা আল্লাহ তা'আলা মানুষকে এই বলে বিশেষিত করেছেন যে, 'আর মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে'।[11]

মানুষ ইলম ও উপলদ্ধির ক্ষেত্রে দুর্বল। অনুরূপভাবে সে দুর্বল ইলম আয়ত্তে আনয়ন ও তাতে ব্যাপকতা অর্জনের ক্ষেত্রেও।

---

[9]. সূরা আল-ক্বামার ১৭।

[10] . সূরা আল-লায়ল ৫-৭।

[11]. সূরা আন-নিসা ২৮।

সেজন্য কিছু কিছু বিষয়ে তার ভুলত্রুটি অবশ্যই হবে। আমরা আলেম সমাজের মধ্যে ভুলত্রুটির কারণগুলো নীচের সাতটা পয়েন্টে সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনার প্রয়াস পাব। যদিও প্রকৃতপক্ষে আরো অনেক কারণ রয়েছে এবং সেগুলো কিনারাবিহীন সাগরের মত। তবে আলেম সমাজের অভিমতগুলো সম্পর্কে বিজ্ঞ ব্যক্তি মতানৈক্যের বিস্তৃত কারণগুলো সম্পর্কে জানেন। এক্ষণে আমরা সেগুলোর আলোচনা শুরু করছিঃ-

কারণ ১: যিনি শরী'আতের হুকুম বর্ণনায় ভুল করেছেন, ভিন্নমত পোষণকারী এই ব্যক্তির কাছে দলীল না পৌঁছা।

এই কারণটা ছাহাবীগণের পরবর্তী যুগের মানুষের মধ্যে কেবল সীমাবদ্ধ নয়; বরং ছাহাবী এবং তৎপরবর্তীগণের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। আমরা দুটো উদাহরণ পেশ করব- যা ছাহাবায়ে কেরামের মধ্যে ঘটে গেছে।

প্রথম উদাহরণঃ- আমরা ছহীহ বুখারী এবং অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে বর্ণিত হাদীছ সম্পর্কে জানি যে, আমীরুল মুমিনীন ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব *রাযিয়াল্লাহু আনহু* যখন সিরিয়ার উদ্দেশ্যে বের হলেন এবং পথিমধ্যে তাঁকে বলা হল, সেখানে মহামারী দেখা দিয়েছে, তখন তিনি থেমে গেলেন এবং ছাহাবীগণের সাথে পরামর্শ করতে লাগলেন। তিনি মুহাজির ও আনছারগণের সাথে পরামর্শ করলেন এবং তাঁরা এ বিষয়ে ভিন্ন দুটো মত পোষণ করলেন। তবে ওখান থেকে ফিরে আসার অভিমতটাই ছিল বেশী

অগ্রাধিকারযোগ্য। মতবিনিময় সভার এক পর্যায়ে আব্দুর রহমান ইবন আওফ *রাযিয়াল্লাহু আনহু* আসলেন- তিনি তাঁর কোন প্রয়োজনে অনুপস্থিত ছিলেন। অতঃপর বললেন, এ বিষয়ে আমার জ্ঞান রয়েছে, আমি রাসূল *ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম*-কে বলতে শুনেছি, 'যখন তোমরা কোন এলাকায় মহামারীর কথা শুনবে, তখন সেখানে যাবে না। কিন্তু যদি তা তোমাদের সেখানে থাকা অবস্থায় দেখা দেয়, তাহলে সেখান থেকে পালানোর উদ্দেশ্যে তোমরা বেরিয়ে যাবে না'।[12] বুঝা গেল, মুহাজির ও আনছারের বড় বড় ছাহাবীর *রাযিয়াল্লাহু আনহুম* এই হুকুম অজানা ছিল। অতঃপর আব্দুর রহমান *রাযিয়াল্লাহু আনহু* এসে তাঁদেরকে এই হাদীছটা সম্পর্কে খবর দিলেন।

দ্বিতীয় উদাহরণঃ- আলী ইবন আবু তালেব *রাযিয়াল্লাহু আনহু* এবং আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস *রাযিয়াল্লাহু আনহু*-এর মতে, কোন গর্ভবতীর স্বামী মারা গেলে চার মাস দশ দিন অথবা বাচ্চা প্রসবের দিন- এই দুই সময়ের মধ্যে দীর্ঘতম সময় পর্যন্ত সে ইদ্দত পালন করবে। অতএব, যদি সে চার মাস দশ দিনের আগে বাচ্চা প্রসব করে, তাহলে তাঁদের নিকট তার ইদ্দত পালনের মেয়াদ এখনও শেষ হয়নি। [অর্থাৎ বাচ্চা প্রসব সত্ত্বেও তাকে ইদ্দত পালন অব্যাহত রাখতে হবে। কেননা এক্ষেত্রে চার মাস দশ

[12] . বুখারী, 'চিকিৎসা' অধ্যায়, হা/৫৭২৯; মুসলিম, 'সালাম' অধ্যায়, হা/২২১৯।

দিন দীর্ঘতম সময়]। আর যদি বাচ্চা প্রসবের আগে চার মাস দশ দিন শেষ হয়ে যায়, তাহলে বাচ্চা প্রসব করা পর্যন্ত সে ইদ্দত পালন করতে থাকবে। [যেহেতু এক্ষেত্রে বাচ্চা প্রসবের সময় হচ্ছে দীর্ঘতম সময়]। কেননা আল্লাহ তা‘আলা এরশাদ করেন, ‘আর গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত’।[13]

অন্যত্র তিনি বলেন, ‘আর তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রীদেরকে রেখে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাদের বিধবাগণ চার মাস দশ দিন প্রতীক্ষা করবে’।[14]

উভয় আয়াতের মধ্যে ‘আম খাছ ওয়াজহী’[15] عموم

[13] . সূরা আত-ত্বালাক ৪।

[14] . সূরা আল-বাক্বারাহ ২৩৪।

[15] এটি উসূলে ফিক্বহ-এর একটা পরিভাষা। দুইটা আয়াত বা হাদীছের প্রত্যেকটাতে একই সময়ে একদিক বিবেচনায় ‘আম’ عام এবং অন্যদিক বিবেচনায় ‘খাছ’ خاص হুকুম পাওয়া গেলে তাকে ‘আম-খাছ ওয়াজহী’ বলে। আর যা দুই বা ততোধিক বস্তুকে অন্তর্ভুক্ত করে, তাকে ‘আম’ عام বলে এবং যা দুই বা ততোধিক বস্তুকে অন্তর্ভুক্ত করে না, তাকে ‘খাছ’ خاص বলে।

আম-খাছ ওয়াজহী-এর উদাহরণ:

মহান আল্লাহ এরশাদ করেন, ‘আর তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রীদেরকে রেখে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাদের বিধবাগণ চার মাস দশ দিন প্রতীক্ষা করবে’ [বাক্বারাহ ২৩৪]। অত্র আয়াত সবধরনের স্ত্রীর ক্ষেত্রে ‘আম’। সুতরাং গর্ভবতী মহিলা, গর্ভবতী নয় এমন মহিলা, বিয়ের পর সহবাস করা হয়েছে এমন মহিলা এবং সহবাস করা হয়নি এমন মহিলা সবাই এই আয়াতের আওতাভুক্ত হবে। এই দিক বিবেচনায় আয়াতটা ‘আম’। কিন্তু যে স্ত্রীর স্বামী মারা গেছে, তার ক্ষেত্রে আয়াতটা ‘খাছ’।

وخصوص وجهي-এর সম্পর্ক। আর এমন সম্পর্কযুক্ত দুই আয়াত বা হাদীছের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের পদ্ধতি হল, এমনভাবে হুকুম গ্রহণ করতে হবে- যাতে উভয় আয়াত বা হাদীছের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় থাকে। তবে তা করতে গেলে আলী ও ইবনু আব্বাস *রাযিয়াল্লাহু আনহুমা*-এর পদ্ধতি মেনে নেওয়া ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই।

কিন্তু সুন্নাত এসবেরই ঊর্দ্ধে। 'সুবায়আ আল-আসলামিইয়া *রাযিয়াল্লাহু আনহা*-এর হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, তিনি সুবায়আ তাঁর স্বামী মারা যাওয়ার কয়েক দিন পরে প্রসূতি অবস্থায় পতিত হলে রাসূল *ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম* তাঁকে আবার বিয়ে করার অনুমতি দেন'।[16] এর অর্থ এই যে, আমরা সূরা ত্বালাকের উক্ত আয়াতের অনুসরণ করব- যে সূরাকে 'ছোট সূরা নিসা' বলা হয়। আর এই আয়াতে আল্লাহর সাধারণ ঘোষণা হচ্ছে, 'আর গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত'।[17]

'আর গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত' [আত-ত্বালাক্ব ৪]। অত্র আয়াত তালাকপ্রাপ্তা ও বিধবা স্ত্রীর ক্ষেত্রে 'আম'। কিন্তু গর্ভবতীদের ক্ষেত্রে 'খাছ'। সুতরাং প্রথম আয়াতের 'আম' হুকুম দ্বিতীয় আয়াতের 'খাছ' হুকুমের উপর এবং দ্বিতীয় আয়াতের 'আম' হুকুম প্রথম আয়াতের 'খাছ' হুকুমের উপর বহন করতে হবে। **তখন অর্থ দাঁড়াবে, গর্ভবতী ব্যতীত স্বামী মারা গেছে এমন সব মহিলা চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করবে**। **আর গর্ভবতী মহিলা সন্তান প্রসব পর্যন্ত ইদ্দত পালন করবে**।-অনুবাদক।

[16] . বুখারী, 'তালাক্ব' অধ্যায়, হা/৫৩১৮-৫৩২০; মুসলিম, 'তালাক্ব' অধ্যায়, হা/১৪৮৪।

[17] . সূরা আত-তালাক্ব ৪।

আমি নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করি, যদি এই হাদীছ আলী ও ইবনু আব্বাস *রাযিয়াল্লাহু আনহুমা* পর্যন্ত পৌঁছত, তাহলে তাঁরা নিশ্চয়ই তা মেনে নিতেন এবং নিজেদের মত ব্যক্ত করতে যেতেন না।

কারণ ২: হাদীছ তাঁর কাছে পৌঁছেছে, কিন্তু তিনি সেটার বর্ণনাকারীর উপর আস্থা স্থাপন করতে পারেন নি। বরং ঐ হাদীছকে তিনি সেটার চেয়ে শক্তিশালী হাদীছের বিরোধী মনে করেছেন। ফলে তার দৃষ্টিতে যেটা শক্তিশালী মনে হয়েছে, তিনি সেটাকেই গ্রহণ করেছেন। এখন আমরা স্বয়ং ছাহাবীগণের মধ্যে ঘটে যাওয়া এমন একটা ঘটনা দিয়ে উদাহরণ পেশ করবঃ

ফাতিমা বিনতে ক্বায়স *রাযিয়াল্লাহু আনহা*-কে তাঁর স্বামী তিন ত্বালাকের সর্বশেষ ত্বালাক দিয়ে দেন। অতঃপর তিনি তাঁর [ফাতিমার] নিকট তাঁর [ফাতিমার স্বামীর] প্রতিনিধির মাধ্যমে কিছু যব ইদ্দতকালীন সময়ে তাঁর খোরপোষ হিসাবে পাঠান। কিন্তু ফাতিমা বিনতে ক্বায়স *রাযিয়াল্লাহু আনহা* এতে ক্রোধান্বিত হন এবং তা নিতে অস্বীকার করেন। অতঃপর এক পর্যায়ে তাঁরা বিষয়টা নিয়ে রাসূল *ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম*-এর কাছে যান এবং রাসূল *ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম* উক্ত মহিলাকে এ মর্মে খবর দেন যে, 'তাঁর জন্য ভরণপোষণের কোন খরচ নেই এবং নেই কোন আবাসন ব্যবস্থা'।[18] কেননা তিনি [ফাতিমার

---

[18] . মুসলিম, 'তালাক্ব' অধ্যায়, হা/১৪৮০।

স্বামী] তাঁর স্ত্রীকে ‘বায়েন ত্বালাক’[19] দিয়ে দিয়েছেন। আর বায়েন ত্বালাকপ্রাপ্তার ভরণপোষণ ও আবাসনের দায়িত্ব তার স্বামীর উপর থাকে না। তবে যদি ঐ মহিলা গর্ভবতী হয়, [তাহলে খোরপোষ ও আবাসন দুটোই দিতে হবে]। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন, ‘তারা গর্ভবতী থাকলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাদের জন্য ব্যয় করবে’।[20]

ওমর *রাযিয়াল্লাহু আনহু*-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও জ্ঞানের কথা বলার অবকাশ নেই। অথচ তাঁর মত মানুষের এই সুন্নাতটা অজানা ছিল। সেজন্য ঐ মহিলার খোরপোষ ও আবাসনের পক্ষে মত দিয়েছিলেন এবং ফাতিমা *রাযিয়াল্লাহু আনহা* ভুলে গেছেন-এই সম্ভাবনার উপর ভিত্তি করে তাঁর হাদীছ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এমনকি তিনি বলেছিলেন, ‘একজন মহিলার কথার উপর ভিত্তি করে আমরা কি আমাদের প্রতিপালকের কথা পরিত্যাগ করব- অথচ আমরা জানি না যে, তার মনে আছে নাকি ভুলে গেছে?’

---

[19] **‘তালাক্ব বায়েন’** طلاق بائن দুই প্রকারঃ **১- ‘ছোট বায়েন তালাক্ব’** طلاق بائن بينونة صغرى: যে তালাক্বের পরে স্বামী তার স্ত্রীকে তার স্ত্রীর সম্মতিতে নতুন বিয়ে ও মোহরের মাধ্যমে আবার ফেরৎ নিতে পারে এবং অন্য কোথাও বিয়ে হয়ে তালাক্বপ্রাপ্তা হওয়ার শর্ত না থাকে, তাকে ‘ছোট বায়েন তালাক’ طلاق بائن بينونة صغرى বলে। যেমনঃ এক বা দুই তালাক্ব দেওয়ার পর স্ত্রী ইদ্দত থেকে বের হয়ে গেলে। ২- **‘বড় বায়েন তালাক্ব’** طلاق بائن بينونة كبرى: যে তালাক্বের পরে স্বামী তার স্ত্রীর সম্মতি এবং নতুন বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে তাকে স্ত্রীকে ফেরৎ নিতে পারে না; বরং স্ত্রীর অন্য জায়গায় স্বাভাবিক বিয়ে হিল্লা বিয়ে নয় এবং উভয়ের সহবাস হতে হয়। অতঃপর বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটতে হয় এবং স্ত্রীকে ইদ্দত পালন করতে হয়, তাকে ‘বড় বায়েন তালাক্ব’ طلاق بائن بينونة كبرى বলে।– অনুবাদক।

[20]. সূরা আত-তালাক্ব ৬।

আর একথার অর্থ এই যে, আমীরুল মুমিনীন ওমর *রাযিয়াল্লাহু আনহু* এই দলীলের প্রতি আস্থাশীল হতে পারেন নি। এমন ঘটনা যেমন ওমর *রাযিয়াল্লাহু আনহু,* অন্যান্য ছাহাবীবর্গ *রাযিয়াল্লাহু আনহুম* এবং তাবেঈন *রহেমাহুমুল্লাহ*-এর ক্ষেত্রে ঘটেছে, তেমনিভাবে তাবে' তাবেঈন *রাযিয়াল্লাহু আনহুম*-এর ক্ষেত্রেও ঘটেছে। এমনিভাবে আমাদের যুগেও অনুরূপ ঘটছে; বরং ক্বিয়ামত পর্যন্ত মানুষ কোন কোন দলীলের বিশুদ্ধতার উপর এভাবে অনাস্থাশীল হতে থাকবে। বিদ্বানগণের কত অভিমতের পক্ষেই তো আমরা হাদীছ দেখতে পাই। কিন্তু কেউ কেউ সেই হাদীছকে ছহীহ জেনে ঐ অভমত গ্রহণ করেন। আবার কেউ কেউ রাসূল *ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম* থেকে ঐ হাদীছের বর্ণনার প্রতি আস্থাশীল না হয়ে উহাকে দুর্বল মনে করতঃ ঐ অভিমত গ্রহণ করেন না।

কারণ ৩: তাঁর কাছে হাদীছ পৌঁছেছে, কিন্তু তিনি তা ভুলে গেছেন। আর যিনি ভুলেন না তিনি তো মহান [আল্লাহ]।

কত মানুষ আছেন- যিনি হাদীছ ভুলে যান; এমনকি কখনও আয়াতও ভুলে যান। রাসূল *ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম* একদিন ছাহাবীগণ *রাযিয়াল্লাহু আনহুম*-কে নিয়ে নামায পড়েন এবং নামাযে তিনি ভুলক্রমে একটা আয়াত ছেড়ে দেন। তাঁর সাথে ছিলেন উবাই ইবনে কাব *রাযিয়াল্লাহু আনহু*। নামায শেষে রাসূল *ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম* বললেন, 'তুমি কি

আমাকে আয়াতটা স্মরণ করিয়ে দিতে পারনি!’[21] অথচ তাঁর উপর অহী নাযিল হয়েছে এবং তাঁকে লক্ষ্য করেই আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন, ‘অচিরেই আমি তোমাকে পাঠ করাবো। ফলে তুমি ভুলবে না। তবে আল্লাহ যা ইচ্ছে করেন, তা ব্যতীত। নিশ্চয়ই তিনি প্রকাশ্য ও গুপ্ত বিষয় পরিজ্ঞাত আছেন’।[22]

আর হাদীছ পৌঁছার পর তা ভুলে যাওয়ার এই কারণটার উদাহরণসমূহের মধ্যে আম্মার ইবন ইয়াসির *রাযিয়াল্লাহু আনহু*-এর সাথে ওমর *রাযিয়াল্লাহু আনহু*-এর ঘটনা অন্যতম। রাসূল *ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম* তাঁদের দু’জনকে কোন এক প্রয়োজনে পাঠালে তাঁরা উভয়েই নাপাক হয়ে যান। এরপর আম্মার গবেষণা করে দেখেন যে, মাটি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জনের মতই। ফলে তিনি মাটিতে গড়াগড়ি দেন- যেমনিভাবে পশু গড়াগড়ি দেয়। এর পেছনে উদ্দেশ্য ছিল, সারা দেহে মাটি মাখিয়ে দেওয়া- যেমনিভাবে পানি মাখাতে হয়। এরপর তিনি নামায আদায় করেন। অপরদিকে ওমর *রাযিয়াল্লাহু আনহু* নামাযই আদায় করলেন না।... অতঃপর তাঁরা রাসূল *ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম*-এর নিকট আসলে তিনি তাঁদেরকে সঠিক নিয়ম বলে দেন। আম্মার *রাযিয়াল্লাহু আনহু*-কে তিনি বলেন, ‘দুই হাত দিয়ে এরকম করলেই তোমার জন্য যথেষ্ট হত’। [একথা বলে] তিনি তাঁর দুই হাত একবার মাটিতে মারলেন। অতঃপর

---

[21] . আবু দাঊদ, ‘ছালাত’ অধ্যায়, হা/৯০৭।

[22]. সূরা আল-আ'লা ৬-৭।

বাম হাতকে ডান হাতের উপর বুলিয়ে উভয় হাতের তালু এবং মুখমণ্ডল মাসাহ করলেন। আম্মার *রাযিয়াল্লাহু আনহু* ওমর *রাযিয়াল্লাহু আনহু*-এর খিলাফতকালে এবং তারও আগে এই হাদীছটা বর্ণনা করতেন। ইতিমধ্যে ওমর *রাযিয়াল্লাহু আনহু* তাঁকে একদিন ডেকে পাঠান এবং তাঁকে লক্ষ্য করে বলেন, তুমি এটা কি ধরনের হাদীছ বর্ণনা করছ? অতঃপর আম্মার *রাযিয়াল্লাহু আনহু* বলেন, আপনার কি মনে পড়ে- রাসূল *ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম* আমাদেরকে কোন এক প্রয়োজনে পাঠালে আমরা নাপাক হয়ে যাই। ফলে আপনি নামায আদায় করেছিলেন না; কিন্তু আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিয়েছিলাম। এরপর রাসূল *ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম* বলেছিলেন, 'দুই হাত দিয়ে এরকম করলেই তোমার জন্য যথেষ্ট ছিল'। কিন্তু ওমর *রাযিয়াল্লাহু আনহু* ঘটনাটা স্মরণ করতে পারলেন না; বরং বললেন, আল্লাহকে ভয় কর হে আম্মার! অতঃপর আম্মার *রাযিয়াল্লাহু আনহু* তাঁকে বললেন, আমার উপর আপনার অনুসরণ করা যেহেতু আল্লাহ আবশ্যক করে দিয়েছেন, সেহেতু আপনি যদি চান যে, এই হাদীছটা আমি আর বর্ণনা করব না, তাহলে তাই করব। তখন ওমর *রাযিয়াল্লাহু আনহু* তাঁকে বললেন, আমি যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছি, তোমাকেও সে দায়িত্ব অর্পণ করলাম'[23]। -অর্থাৎ তুমি এই হাদীছ মানুষকে বর্ণনা কর-। তাহলে দেখা গেল, ছোট অপবিত্র অবস্থায় যে তায়াম্মুম রাসূল *ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম*

---

[23]. বুখারী, 'তায়াম্মুম' অধ্যায়, হা/৩৩৮, ৩৪৫, ৩৪৬; মুসলিম, 'ঋতুস্রাব' অধ্যায়, হা/৩৬৮।

নির্ধারণ করেছেন, ঠিক ঐ একই তায়াম্মুম বীর্যস্খলন জনিত কারণে অপবিত্র অবস্থায়ও নির্ধারণ করেছেন- একথাটা ওমর *রাযিয়াল্লাহু আনহু* ভুলে গেছেন এবং তিনি এ বিষয়ে আব্দুল্লাহ ইবন মাসঊদ *রাযিয়াল্লাহু আনহু*-এর পক্ষেই ছিলেন। আর আব্দুল্লাহ ইবন মাসঊদ *রাযিয়াল্লাহু আনহু* ও আবু মূসা *রাযিয়াল্লাহু আনহু*-এর মাঝে এ বিষয়ে বিতর্কও হয়েছে। বিতর্কে আবু মূসা *রাযিয়াল্লাহু আনহু* ওমর *রাযিয়াল্লাহু আনহু*-এর উদ্দেশ্যে বলা আম্মার *রাযিয়াল্লাহু আনহু*-এর উক্তিটা পেশ করেন। তখন ইবনু মাসঊদ *রাযিয়াল্লাহু আনহু* বলেন, তুমি কি দেখনি যে, ওমর *রাযিয়াল্লাহু আনহু* আম্মার *রাযিয়াল্লাহু আনহু*-এর কথায় পরিতুষ্ট হতে পারেননি? অতঃপর আবু মূসা *রাযিয়াল্লাহু আনহু* বলেন, ঠিক আছে আম্মার *রাযিয়াল্লাহু আনহু*-এর কথা না হয় বাদই দিলাম, কিন্তু এই আয়াত সম্পর্কে তুমি কি বলবে?-অর্থাৎ সূরা আল–মায়েদার আয়াত-। জবাবে ইবনে মাসঊদ *রাযিয়াল্লাহু আনহু* কিছুই বললেন না। যাহোক, নিঃসন্দেহে এখানে অধিকাংশ বিদ্বানের কথাই সঠিক-যারা বলছেন, বীর্যপাত জনিত কারণে অপবিত্র ব্যক্তি তায়াম্মুম করতে পারে-যেমনিভাবে ছোট নাপাকীর কারণে অপবিত্র ব্যক্তি তায়াম্মুম করতে পারে।

এ ঘটনা বর্ণনার উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষ ভুলে যেতে পারে এবং শার‘ঈ কোন হুকুম তার কাছে অজানা থেকে যেতে পারে। ফলে সে যদি কিছু [ভুল] বলে, তাহলে সে ওযরগ্রস্ত হিসাবে গণ্য

হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি দলীল জানবে, সে তো ওযরগ্রস্ত হিসাবে পরিগণিত হবে না।

কারণ ৪: তাঁর কাছে হাদীছ পৌঁছেছে; কিন্তু তিনি হাদীছের অর্থ উল্টা বুঝেছেন।

আমরা এর দুটো উদাহরণ পেশ করবঃ একটা কুরআন থেকে এবং অপরটা হাদীছ থেকে।

১. কুরআন থেকেঃ মহান আল্লাহর বাণী, 'তোমরা যদি রোগগ্রস্ত হও কিংবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ পায়খানা থেকে আসে কিংবা তোমরা স্ত্রীদেরকে স্পর্শ কর, অতঃপর পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও'।[24]

বিদ্বানগণ 'কিংবা তোমরা স্ত্রীদেরকে স্পর্শ কর' আয়াতাংশের অর্থ করতে গিয়ে মতভেদ করেছেন। তাঁদের কেউ কেউ বুঝেছেন, 'স্বাভাবিক স্পর্শ'। কেউ কেউ বুঝেছেন, 'যৌন উত্তেজনার সহিত স্পর্শ'। আবার কেউ কেউ বুঝেছেন, 'সহবাস'। আর এটা [শেষেরটা] ইবনু আব্বাস *রাযিয়াল্লাহু আনহু*-এর অভিমত।

এখন আপনি যদি আয়াতটা নিয়ে ভালভাবে চিন্তা করেন, তাহলে দেখবেন যে, যাঁরা আয়াতাংশের অর্থ করেছেন 'সহবাস' তাঁদের কথাই ঠিক। কেননা মহান আল্লাহ পানি দিয়ে পবিত্রতা

---

[24] . সূরা আন-নিসা ৪৩; সূরা আল-মায়েদা ৬।

অর্জনের ক্ষেত্রে দুই প্রকার পবিত্রতার কথা উল্লেখ করেছেন। একটা ছোট অপবিত্রতা الحدث الأصغر থেকে পবিত্রতা অর্জন এবং অপরটা বড় অপবিত্রতা الحدث الأكبر থেকে পবিত্রতা অর্জন। ছোট অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জনের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর বাণী হচ্ছে, 'তোমাদের মুখমণ্ডল ধৌত কর এবং হাতগুলোকে কনুই পর্যন্ত ধুয়ে নাও। আর মাথা মাসাহ কর এবং পাগুলোকে টাখনু পর্যন্ত ধুয়ে ফেল'।[25]

আর বড় অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জনের ক্ষেত্রে তাঁর বাণী হচ্ছে, 'কিন্তু যদি তোমরা অপবিত্র থাক, তাহলে বিশেষভাবে পবিত্র হবে'।[26]

এক্ষণে পবিত্র কুরআনের বালাগাত ও ফাছাহাত তথা ভাষালঙ্কার ও ভাষাশৈলির দাবী হচ্ছে, তায়াম্মুমের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জনের ক্ষেত্রেও দুই প্রকার পবিত্রতার কথা উল্লেখ করা। অতএব মহান আল্লাহর বাণী, 'অথবা তোমাদের কেউ যদি পায়খানা থেকে আসে' দ্বারা ছোট অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জনের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে... এবং 'কিংবা তোমরা স্ত্রীদেরকে স্পর্শ কর' দ্বারা বড় অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জনের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।... সে কারণে এখানে আমরা যদি 'স্পর্শ' -الملامسةকে ['সহবাস' অর্থে না নিয়ে] 'স্পর্শ' অর্থে

[25] . সূরা আল-মায়েদাহ ৬।

[26] . প্রাগুক্ত।

নিই, তাহলে দেখা যায়, উক্ত আয়াতে ছোট অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জনের কারণসমূহের দুটো কারণ উল্লেখ রয়েছে; কিন্তু বড় অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জনের ক্ষেত্রে কোন কিছুরই উল্লেখ নেই। আর এটা পবিত্র কুরআনের বালাগাতের পরিপন্থী। যাহোক, যারা আয়াতাংশের অর্থ 'সাধারণ স্পর্শ' বুঝেছেন, তারা বলেছেন, কোন পুরুষ যদি স্ত্রীর চামড়া স্পর্শ করে, তাহলে তার অযু ভেঙ্গে যাবে। অথবা যদি সে যৌন কামনা নিয়ে স্ত্রীর চামড়া স্পর্শ করে, তাহলে অযু ভাঙবে আর যৌন কামনা ছাড়াই স্পর্শ করলে অযু ভাঙবে না। অথচ সঠিক কথা হল, উভয় অবস্থাতেই অযু ভাঙবে না। কেননা হাদীছে এসেছে, রাসূল *ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম* তাঁর কোন এক স্ত্রীকে চুম্বন করতঃ নামায পড়তে গেলেন অথচ অযু করলেন না।[27] আর এই বর্ণনাটা কয়েকটা সূত্রে এসেছে- যার একটা অপরটাকে শক্তিশালী করে।

২. হাদীছ থেকেঃ রাসূল *ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম* যখন আহযাবের যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে যুদ্ধের প্রস্তুতি ক্ষান্ত করলেন, তখন জিবরীল *আলাইহিস্ সালাম* এসে তাঁকে বললেন, আমরা অস্ত্র সমর্পণ করিনি। সুতরাং আপনি বনী ক্বুরাইযা-এর উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যান। ফলে রাসূল *ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম* তাঁর ছাহাবীগণকে *রাযিয়াল্লাহু আনহুম* বেরিয়ে পড়ার আদেশ করলেন এবং বললেন, 'কেউ যেন বনী ক্বুরাইযা ছাড়া

---

[27] . আবু দাঊদ, 'পবিত্রতা' অধ্যায়, হা/১৭৮, ১৭৯; তিরমিযী, 'পবিত্রতা' অধ্যায়, হা/৮৬; ইবনু মাজাহ, 'পবিত্রতা' অধ্যায়, হা/৫০২, ৫০৩।

অন্য কোথাও আছরের নামায না পড়ে'। [দেখা গেল,] ছাহাবীবর্গ এই হাদীছটা বুঝার ক্ষেত্রে মতভেদ করলেন। তাঁদের কেউ কেউ বুঝলেন, রাসূল *ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম*-এর উদ্দেশ্য হল, দ্রুত রওয়ানা করা- যাতে আছরের সময় হওয়ার আগেই তাঁরা বনী ক্বুরাইযাতে উপস্থিত থাকেন। সেজন্য তাঁরা রাস্তায় থাকা অবস্থায় যখন আছরের নামাযের সময় হল, তখন তাঁরা নামায আদায় করে নিলেন এবং নামাযের সময় শেষ হওয়া পর্যন্ত নামাযকে বিলম্বিত করলেন না। আবার তাঁদের অনেকেই বুঝলেন, রাসূল *ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম*-এর উদ্দেশ্য হল, তাঁরা যেন বনী ক্বুরাইযায় না পৌঁছে নামায আদায় না করে। সেজন্য তারা নামাযকে বনী ক্বুরাইযাতে পৌঁছার সময় পর্যন্ত বিলম্বিত করলেন- এমনকি নামাযের ওয়াক্তও শেষ হয়ে গেল।[28]

নিঃসন্দেহে যাঁরা সঠিক সময়ে নামায আদায় করেছেন, তাঁদের বুঝটাই ছিল সঠিক। কেননা সময়মত নামায ওয়াজিব হওয়ার উদ্ধৃতিগুলো 'সুস্পষ্ট' محكمة। পক্ষান্তরে এই উদ্ধৃতিটা হচ্ছে 'অস্পষ্ট' متشابهة। আর নিয়ম হচ্ছে, মুহকাম নির্দেশ মুতাশাবেহ-নির্দেশের উপর প্রাধান্য পাবে। অতএব, বুঝা গেল, কোন দলীলকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল *ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম*-

---

[28] . বুখারী, 'ভীতি' অধ্যায়, হা/৯৪৬; মুসলিম, 'যুদ্ধবিগ্রহ' অধ্যায়, হা/১৭৭০। ছহীহ মুসলিমে এসেছে এভাবে, 'কেউ বনী ক্বুরায়যায় না পৌঁছে যেন আছরের নামায আদায় না করে'।

এর উদ্দেশ্যের উল্টা বুঝা মতানৈক্যের অন্যতম কারণ। আর এটাই হচ্ছে চার নম্বর কারণ।

কারণ ৫: তাঁর কাছে হাদীছ পৌঁছেছে; কিন্তু হাদীছটা [নতুন বিধান অবতীর্ণ হওয়ার কারণে] রহিত منسوخ। কিন্তু সেই আলেম বা বিদ্বান ব্যক্তি রহিতকারী নতুন সেই বিধান সম্পর্কে জানেন না।

সুতরাং এখানে হাদীছটা ছহীহ এবং উহার অর্থ ও তাৎপর্যও বোধগম্য; কিন্তু তা রহিত। আর উক্ত আলেম যেহেতু হাদীছটা রহিত হওয়ার বিষয়ে জানেন না, সেহেতু সেটা তার জন্য ওযর হিসাবে গণ্য হবে। কেননা [শরঈ বিধানের ক্ষেত্রে] আসল হল, রহিত না হওয়া, যতক্ষণ না রহিতকারী নতুন বিধান সম্পর্কে জানা যায়।

এই কারণে মুছল্লী রুকূতে যেয়ে কিভাবে তার হস্তদ্বয় রাখবে, সে বিষয়ে ইবনু মাসঊদ *রাযিয়াল্লাহু আনহু* ভিন্নমত পোষণ করেছেন। [ঘটনা হচ্ছে], ইসলামের প্রাথমিক যুগে [রুকূতে] মুছল্লীর জন্য নিয়ম ছিল, দুই হাত একত্রে করে দুই হাঁটুর মাঝখানে রাখা। কিন্তু পরবর্তীতে তা রহিত হয়ে নতুন বিধান চালু হয়। নতুন বিধান হচ্ছে, দুই হাত দুই হাঁটুর উপরে রাখা। ছহীহ বুখারীসহ অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে রহিত হওয়ার বিষয়টা প্রমাণিত হয়েছে।[29] কিন্তু ইবনু মাসঊদ *রাযিয়াল্লাহু আনহু* রহিত

---

[29] . বুখারী, 'আযান' অধ্যায়, হা/৭৯০।

হওয়ার বিষয়টা জানতেন না। ফলে, তিনি দুই হাত একত্রে করে দুই হাঁটুর মাঝখানেই রাখতেন। [একদিন] তাঁর পাশে আলক্বামা ও আল–আসওয়াদ *রাযিয়াল্লাহু আনহুমা* নামায পড়তে দাঁড়ালেন এবং তাঁরা তাঁদের দুই হাত দুই হাঁটুর উপর রাখলেন। কিন্তু ইবনু মাসঊদ *রাযিয়াল্লাহু আনহু* তাঁদেরকে অনুরূপ করতে নিষেধ করলেন এবং দুই হাতকে একত্র করতঃ দুই হাঁটুর মাঝখানে রাখার আদেশ করলেন।[30] কিন্তু কেন? কারণ তিনি রহিত হওয়ার বিষয়টা জানতে পারেন নি। আর মানুষের উপর তার সাধ্যের বাইরে কোন কিছু চাপানো হয়নি। মহান আল্লাহ বলেন, ‘আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না। সে তাই পায়, যা সে উপার্জন করে এবং তাই তার উপর বর্তায়, যা সে করে। হে আমাদের পালনকর্তা! যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তবে আমাদেরকে অপরাধী করো না। হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের উপর এমন দায়িত্ব অর্পণ করো না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর অর্পণ করেছ। হে আমাদের প্রভু! আমাদের দ্বারা এমন বোঝা বহন করাইও না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ মোচন কর। আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমিই আমাদের প্রভু। সুতরাং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর’।[31]

---

[30]. মুসলিম, ‘মসজিদসমূহ’ অধ্যায়, হা/৫৩৪।

[31] . সূরা আল-বাক্বারাহ ২৮৬।

<u>কারণ ৬:</u> ভুলকারী ঐ ব্যক্তির বিশ্বাস, তাঁর কাছে যে দলীল পৌঁছেছে তা তার চেয়ে শক্তিশালী উদ্ধৃতি বা ইজমার বিরোধী। অর্থাৎ দলীল পেশকারীর কাছে দলীল পৌঁছেছে; কিন্তু তাঁর মতে, উক্ত দলীল সেটার চেয়ে শক্তিশালী উদ্ধৃতি বা ইজমার বিরোধী। আর আলেমগণের মতানৈক্যের পেছনে এই কারণটার ভূমিকা অনেক বেশী। সেজন্য আমরা কোন কোন আলেমকে ইজমার উদ্ধৃতি দিতে শুনি। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তা ইজমা নয়।

ইজমার উদ্ধৃতি পেশের ক্ষেত্রে অদ্ভুত উদাহরণ হচ্ছে: কেউ কেউ বলেন, দাসের সাক্ষ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে তাঁরা একমত হয়েছেন। আবার কেউ কেউ বলেন, দাসের সাক্ষ্য গ্রহণীয় নয় মর্মে তাঁরা একমত হয়েছেন। এটা অদ্ভুত একটা বর্ণনা! কেননা কেউ কেউ যখন তাঁর আশেপাশের সবাইকে কোন বিষয়ে একমত হতে দেখেন, তখন সেই বিষয়টা উদ্ধৃতিসমূহের [কুরআন-হাদীছের উদ্ধৃতি] অনুকূলে ভাবেন এবং মনে করেন, তাঁদের বিরোধী কোন দলীল নেই। সেজন্য তাঁর ব্রেইনে দুই ধরনের দলীলের সমাবেশ ঘটে [কুরআন-হাদীছের] উদ্ধৃতি ও ইজমা। এমনকি তিনি মনে করেন, ঐ বিষয়টা সঠিক ক্বিয়াস এবং দৃষ্টিভঙ্গিরও অনুকূলে। ফলে, তিনি ঐ বিষয়ে মতানৈক্য না থাকার পক্ষে মত প্রকাশ করেন এবং সঠিক ক্বিয়াসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কুরআন ও ছহীহ হাদীছের উদ্ধৃতির বিরোধী কোন দলীল আছে বলে তিনি মনে করেন না। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে, বিষয়টা ছিল উল্টা।

আমরা 'রিবাল ফায্ল'[32] رِبَا الْفَضْلِ এর ক্ষেত্রে ইবনু আব্বাস *রাযিয়াল্লাহু আনহুমা*- এর অভিমতটাকে উদাহরণ হিসাবে পেশ করতে পারিঃ-

রাসূল *ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম* বলেন, 'সুদ শুধুমাত্র 'রিবান-নাসীআহ'[33] رِبَا النَسِيْئَةِ-এর ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ'।[34] উবাদাহ ইবনু ছামেত *রাযিয়াল্লাহু আনহু* সহ অন্যান্য ছাহাবী থেকে বর্ণিত হাদীছে প্রমাণিত হয়েছে, 'রিবান-নাসীআহ' এবং 'রিবাল ফায্ল' উভয় ক্ষেত্রেই সুদ হবে'।[35]

---

[32] فضل **–অর্থঃ** অতিরিক্ত, বাড়তি ইত্যাদি। সাধারণতঃ পরিমাপ পাত্র দ্বারা মাপ করা হয় অথবা কেজি-বাটখারা দ্বারা ওযন করা হয় এমন বস্তু অনুরূপ একই শ্রেণীর বস্তুর বিনিময়ে কম বা বেশী দেওয়া-নেওয়ার শর্তে ক্রয়-বিক্রয় করার নাম 'রিবাল ফায্ল' ربا الفضل। এই সূদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত জিনিসটা কোন কিছুর বিনিময়ে আদান-প্রদান হয় না এবং লেনদেন হাতে হাতে সম্পন্ন হয়।–[অনুবাদক]।

[33] نسيئة **-অর্থঃ** বিলম্ব, দেরী। এই প্রকার সূদে লেনদেনকৃত দুটো বস্তুর একটা মূল বস্তুর চেয়ে বেশী পরিমাণে আদান-প্রদান হয় এবং সেই অতিরিক্ত বস্তুটা মূলধনকে দেরীতে অল্প হলেও পরিশোধের বিনিময়ে হয়ে থাকে বলে একে 'রিবান-নাসীআহ' ربا النسيئةবলে। আর এটা সাধারণতঃ পরিমাপ পাত্র দ্বারা মাপ করা হয় এমন অথবা বাটখারা দ্বারা ওযন করা হয় এমন বস্তু অথবা একই শ্রেণীর অন্য যেকোন বস্তুর লেনদেনের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে, অন্য ক্ষেত্রে নয়। সেজন্য লেনদেনকৃত দুটো বস্তুর একটা যদি টাকা-পয়সা হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে সূদ হবে না। [অনুবাদক]

[34] . ইমাম বুখারী হাদীছটা নিম্নোক্ত শব্দে বর্ণনা করেছেন, 'নাসীআর ক্ষেত্রে ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে সূদ নেই'। 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়, হা/২১৭৮-২১৭৯; মুসলিম, 'বরগা চাষ' অধ্যায়, হা/১৫৯৬; ইবনু মাজাহ, 'ব্যবসা-বাণিজ্য' অধ্যায়, হা/২২৫৭।

[35] . মুসলিম, 'বরগা চাষ' অধ্যায়, হা/১৫৮৭।

ইবনু আব্বাস *রাযিয়াল্লাহু আনহু*-এর পরে সকল আলেম একমত হয়েছেন যে, সুদ দুই প্রকারঃ ১ 'রিবাল ফায্‌ল' ربا الفضل ও ২ 'রিবান নাসীআহ' ربا النسيئة। কিন্তু ইবনু আব্বাস *রাযিয়াল্লাহু আনহু* নাসীআহ ব্যতীত অন্য কিছুতে সুদ হওয়ার বিষয়টা অস্বীকার করেছেন। যেমনঃ যদি তুমি হাতে হাতে এক ছা গম দুই ছা গমের বিনিময়ে বিক্রয় কর, তাহলে ইবনু আব্বাস *রাযিয়াল্লাহু আনহুমা*-এর নিকটে কোন সমস্যাই নেই। কেননা তাঁর মতে, সুদ কেবলমাত্র নাসীআহ-এর ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ।

অনুরূপভাবে, যদি তুমি দুই 'মিছক্বাল' [সোনার ওযন বিশেষ] সোনার বিনিময়ে এক 'মিছক্বাল' সোনা হাতে হাতে বিক্রয় কর, তাহলে তাঁর নিকটে সুদ হবে না। তবে যদি গ্রহণ করতে দেরী কর অর্থাৎ তুমি আমাকে যদি এক 'মিছক্বাল' সোনা দাও কিন্তু আমি তার মূল্য যদি তোমাকে এখন না দিয়ে উভয়ে বেচাকেনার বৈঠক থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার পরে দেই, তাহলে সেটা সুদ হবে। কেননা ইবনু আব্বাস *রাযিয়াল্লাহু আনহু*-এর মতে, হাদীছে উল্লেখিত এই সীমাবদ্ধতা [নাসীআহ ছাড়া] অন্য কিছুতে সুদ হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক। আর আসলেই إنما শব্দটা সীমাবদ্ধতা অর্থে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং তা [নাসীআহ] ছাড়া অন্য কিছুতে সুদ হবে না।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উবাদাহ *রাযিয়াল্লাহু আনহু*-এর হাদীছ প্রমাণ করে যে, 'রিবাল ফায্‌ল'ও সুদের অন্তর্ভুক্ত। কেননা রাসূল

ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন, ‘যে ব্যক্তি বেশী দিল বা নিল, সে সুদী কারবার করল’।[36]

এক্ষণে, ইবনু আব্বাস *রাযিয়াল্লাহু আনহু* কর্তৃক দলীল হিসাবে পেশকৃত হাদীছের ক্ষেত্রে আমাদের ভূমিকা কি হবে?

আমাদের ভূমিকা হবে, হাদীছটাকে আমরা এমন অর্থে গ্রহণ করব, যাতে ‘রিবাল ফায্ল’-কে সুদ গণ্যকারী হাদীছের সাথে এই হাদীছও মিলে যায়। সেজন্য আমরা বলব: মারাত্মক সুদ হচ্ছে, ‘রিবান নাসীআহ’- যার কারবার জাহেলীযুগের লোকেরা করত এবং যে সম্পর্কে কুরআনে এরশাদ হচ্ছে, ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ খেওনা’।[37] তবে ‘রিবাল ফায্ল’ তদ্রুপ মারাত্মক নয়[38]। সে কারণে ইবনুল ক্বাইয়িম *রহেমাহুল্লাহ* তাঁর [জগদ্বিখ্যাত] গ্রন্থ ‘এ‘লামুল মুওয়াক্কেঈন’ إعلام الموقعين-এ বলেন, মূল সুদের অন্যতম মাধ্যম হওয়ার কারণে ‘রিবাল ফাম্ল’-কে হারাম করা হয়েছে। সেটাই যে মূল সুদ, সে হিসাবে নয়।

---

36 . মুসলিম, ‘বরগা চাষ’ অধ্যায়, হা/১৫৮৮।

37 . সূরা আলে-ইমরান ১৩০।

38 ‘রিবাল ফাযল’ ‘রিবান নাসীআহ’-এর মত মারাত্মক না হলেও তা হারাম। সুতরাং কেউ যেন ইহাকে তুচ্ছজ্ঞান করে কোনক্রমেই সূদী কারবারে জড়িয়ে না পড়ে। কেননা, অপেক্ষাকৃত ছোট পাপ করতে করতে মানুষ কখন যে নিজের অজান্তেই অনেক বড় পাপ করে বসে, তা বলা যায় না। মনে রাখতে হবে, পরকালে সুদী কারবারের পরিণতি বড় কঠিন হবে। মহান আল্লাহ আমাদেরকে হেফাযত করুন। আমীন!– [অনুবাদক]।

কারণ ৭: আলেম যঈফ হাদীছকে [দলীল হিসাবে] গ্রহণ করেন অথবা [দলীল শক্তিশালী, কিন্তু] তাঁর দলীলের বুঝ্ বা উপলব্ধিটা দুর্বল।

আর এমন ঘটনা বহু ঘটে থাকে। যঈফ হাদীছ দ্বারা দলীল পেশের অন্যতম একটা **উদাহরণ হচ্ছে**, কোন কোন আলেম 'ছালাতুত্ তাসবীহ'-কে উত্তম বলেন। 'ছালাতুত্ তাসবীহ' হচ্ছে, দুই রাক'আত নামায আদায়- যাতে দণ্ডায়মান অবস্থায় সূরা ফাতিহা এবং ১৫ বার তাসবীহ পাঠ করা হয়। অনুরূপভাবে রূকূ ও সিজদাহ সহ নামাযের শেষ পর্যন্ত সব জায়গায় তাসবীহ পাঠ করা হয়। আসলে ঐ নামাযের নিয়ম-কানুন আমি ভালভাবে রপ্ত করিনি। কারণ শারঈ দৃষ্টিকোণ থেকে আমি সেটাকে ঠিক মনে করি না। আবার কেউ কেউ বলেন, 'ছালাতুত্ তাসবীহ' জঘন্য বিদআত এবং এ মর্মের হাদীছ ছহীহ নয়। ইমাম আহমাদ *রহেমাহুল্লাহ* এ মতের পক্ষে। তিনি বলেন, রাসূল *ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম* থেকে উহা সাব্যস্ত নয়। শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ *রহেমাহুল্লাহ* বলেন, 'ছালাতুত্ তাসবীহ' সংক্রান্ত হাদীছ হলো রাসূল *ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম*-এর উপর মিথ্যা রটনা। আর বাস্তবেই যিনি এ সম্পর্কে গবেষণা করবেন, তিনি দেখবেন যে, এমনকি শরী'আতের দৃষ্টিকোণ থেকেও ইহা অস্বাভাবিক ও ব্যতিক্রম একটা বিধান। কেননা ইবাদত হয় অন্তরের জন্য উপকারী হবে নতুবা উপকারী হবে না। আর উপকারী হলে সব সময় এবং সব জায়গায় তা শরীআতসম্মত

হবে। পক্ষান্তরে উপকারী না হলে শরীআতসম্মত হবে না। আর যে হাদীছে এই নামায সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, সেখানে বলা হয়েছে, মানুষ প্রত্যেক দিন, অথবা সপ্তাহে একদিন অথবা মাসে একদিন বা জীবনে অন্ততঃ একদিন আদায় করবে। ইসলামী শরী'আতে এরকম আর কোন ইবাদত নেই। সেজন্য এ সংক্রান্ত হাদীছ সনদ এবং মতন উভয় দিক থেকেই ব্যতিক্রম এবং শায়খুল ইসলামের মত যিনি সেগুলোকে মিথ্যা বলেছেন, তাঁর বক্তব্যই সঠিক। আর সেকারণেই শায়খুল ইসলাম বলেন, কোন আলেমই এই নামাযকে উত্তম বলেন নি। নারী-পুরুষ কর্তৃক ব্যাপকভাবে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হয় বলে আমি এই উদাহরণটা পেশ করেছি। এই বিদ'আতী আমল শরীআতসম্মত গণ্য করা হবে মর্মে আমি ভয় পেয়েছি। কিছু কিছু মানুষের কাছে ভারী মনে হতে পারে ভেবেও আমি উহাকে বিদ'আতই বলছি। কেননা কুরআন ও হাদীছে নেই এমন যা কিছু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা হয়, তা-ই বিদআত।

দলীল শক্তিশালী কিন্তু দলীলের বুঝ বা উপলদ্ধিটা দুর্বল হওয়ার **উদাহরণঃ** হাদীছে এসেছে, 'গর্ভস্থ বাচ্চার মাকে যবেহ করাই হল গর্ভস্থ বাচ্চাকে যবেহ করা'।[39] আলেম সমাজের নিকট এই হাদীছের প্রসিদ্ধ অর্থ হল, যদি গর্ভস্থ বাচ্চার মাকে যবেহ করা হয়, তাহলে সেই যবেহ গর্ভস্থ বাচ্চার জন্যও যবেহ হিসাবে

---

[39]. আবু দাঊদ, 'কুরবানী' অধ্যায়, হা/২৮২৮; তিরমিযী, 'শিকার' অধ্যায়, হা/১৪৭৬, তিনি হাদীছটাকে 'ছহীহ' বলেছেন; ইবনু মাজাহ, 'যবেহ' অধ্যায়, হা/৩১৯৯।

গণ্য হবে। অর্থাৎ মাকে যবেহ করার পর যখন বাচ্চাকে পেট থেকে বের করা হবে, তখন তাকে আর যবেহ করার প্রয়োজন পড়বে না। কেননা বাচ্চা ইতিমধ্যে মারা গেছে। আর মারা যাওয়ার পর যবেহ করায় কোন লাভ নেই।

আবার কেউ কেউ হাদীছটার অর্থ এরূপ বুঝেছেন যে, গর্ভস্থ বাচ্চাকে তার মায়ের মত করেই যবেহ করতে হবে। ঘাড়ের দুই রগ কেটে দিতে হবে এবং রক্ত প্রবাহিত করতে হবে। কিন্তু এটা অবাস্তব। কারণ মৃত্যুর পর রক্ত প্রবাহিত করা সম্ভব নয়। রাসূল *ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম* বলেন, 'যার রক্ত প্রবাহিত করা হয় এবং আল্লাহর নামে যবেহ করা হয়, তা খাও'।[40] আর একথা স্পষ্ট যে, মৃত্যুর পরে রক্ত প্রবাহিত করা সম্ভব নয়।

কিনারা বিহীন সাগরের মত অসংখ্য কারণের মধ্যে উক্ত কারণগুলোর কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া আমি ভাল মনে করেছি। **কিন্তু এত কিছুর পরে আমাদের ভূমিকা কি হবে?**

আমি আলোচনার শুরুতেই বলেছি, শ্রবণযোগ্য, পঠনযোগ্য, দর্শনযোগ্য ইত্যাকার নানা প্রচার মাধ্যম এবং এই প্রচার মাধ্যমগুলোতে আলেম ও বক্তাগণের মতানৈক্যের কারণে

---

[40] . বুখারী, 'যবেহ' অধ্যায়, হা/৫৪৯৮; মুসলিম, 'কুরবানী' অধ্যায়, হা/১৯৬৮; আবু দাঊদ, 'কুরবানী' অধ্যায়, হা/২৮২৭; নাসাঈ, 'কুরবানী' অধ্যায়, হা/৪৪০৩-৪৪০৪; ইবনু মাজাহ, 'যবেহ' অধ্যায়, হা/৩১৭৮।

সাধারণ মানুষ সন্দীহান হয়ে পড়ছে আর বলছে, আমরা কার অনুসরণ করব? [কবি বলেন,]

تكاثرت الظباء على خراش

فما يدري خراش ما يصيد

অর্থাৎ: 'শিকারী কুকুরের নিকট হরিণ এতই বেশী হয়ে গেছে যে, সে কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা শিকার করবে তা বুঝতেই পারছে না'।

এক্ষণে এসব মতানৈক্যের ব্যাপারে আমরা আমাদের ভূমিকার কথা আলোচনা করব। এখানে আমরা আলেমগণের মতানৈক্য বলতে ঐসকল আলেমকে বুঝিয়েছি, যাঁরা ইলম ও দ্বীনদারিতায় নির্ভরযোগ্য। যাঁদেরকে আলেম মনে করা হয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা আলেম নয়- এমন সব ব্যক্তির মতানৈক্য আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কেননা তাদেরকে আমরা আলেম মনে করি না এবং প্রকৃত আলেমগণের উক্তিসমূহ যেমন সংরক্ষণ করা হয়, আমরা তাদের উক্তিসমূহকে সেই পর্যায়ের মনে করি না। সেজন্য যেসব আলেম মুসলিম উম্মাহ, ইসলাম ও ইল্‌ম বিষয়ে [মানুষকে] হিতোপদেশ দিয়ে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন, আমরা আলেম বলতে তাঁদেরকেই বুঝি। ঐসব আলেমের ব্যাপারে আমাদের ভূমিকা দুইভাবে হতে পারেঃ-

১. [আমাদেরকে জানতে হবে] ঐ সকল আলেম আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূল *ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম*-এর সুন্নাত মোতাবেক কোন বিষয় হওয়া সত্ত্বেও কেন তদ্বিষয়ে মতানৈক্য করেছেন? মতানৈক্যের যেসব কারণ আমরা উল্লেখ করেছি এবং যেগুলো উল্লেখ করিনি, সেগুলোর মাধ্যমে এর জবাব জানা যেতে পারে। আর সেই কারণগুলো আসলে অনেক- যা শরী'আতের জ্ঞান পিপাসুর নিকট স্পষ্ট, যদিও তিনি গভীর জ্ঞানের অধিকারী না হন।

২. [এরপর দেখতে হবে] তাঁদের অনুসরণের ব্যাপারে আমাদের করণীয় কি হবে? তাঁদের মধ্যে আমরা কার অনুসরণ করব? মানুষ কি কোন ইমামের এমন অনুসরণ করবে যে, তাঁর কথার বাইরে যাবে না- যদিও হক্ব অন্যের সাথে থাকে-যেমনটি মাযহাবসমূহের অন্ধ ভক্তদের স্বভাব, নাকি তার কাছে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত দলীলের অনুসরণ করবে- যদিও তা তার অনুসারী ইমামের বিরোধী হয়? এই দ্বিতীয়টাই সঠিক জবাব। সেজন্য যিনি দলীল জানতে পারবেন তার উপর সেই দলীলের অনুসরণ করা আবশ্যক- যদিও তা ইমামের বিরোধী হয়। তবে তা যেন ইজমার বিরোধী না হয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি বিশ্বাস করবে, রাসূল *ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম* ব্যতীত অন্য কারো কথা সর্বাবস্থায় এবং সব সময় অবশ্য পালনীয়, সে অন্য কারো জন্য রিসালাতের বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করল। কেননা রাসূল *ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম* ব্যতীত অন্য কারো কথার বিধান এমনটা

হতে পারে না এবং অন্য কারো কথা সর্বদা শিরোধার্য হতে পারে না।

তবে এ বিষয়ে আরো একটু চিন্তাভাবনার বিষয় রয়েছে। কেননা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দলীল থেকে কে হুকুম-আহকাম বের করবেন তদ্বিষয়ে আমরা এখনও গোলকধাঁধায়? এটা মুশকিলও বটে। কেননা প্রত্যেকেই বলছেন, আমি এই ক্ষমতার অধিকারী। এটা আসলে ভাল কথা নয়। যদিও কুরআন ও সুন্নাহ একজন মানুষের গাইড হবে- সে দিক বিবেচনায় সেটা ভাল কথা। কিন্তু এর মানে এই নয় যে, অর্থ জানুক বা না জানুক কোন রকম দলীল উচ্চারণ করতে পারে এমন প্রত্যেকের জন্য আমরা দরজা খুলে দেব আর বলব, তুমি মুজতাহিদ [শরী'আত গবেষক], যা ইচ্ছা তুমি তাই বলতে পার। এমনটা হলে ইসলামী শরীআত, মানব ও মানব সমাজে পচন ধরবে। **এক্ষেত্রে মানুষ তিন ধরনেরঃ-**

১. প্রকুত আলেম– যাঁকে আল্লাহ ইল্‌ম ও উপলব্ধি দুটোই দান করেছেন।

২. [দ্বীনের] জ্ঞান পিপাসু- যার ইল্‌ম রয়েছে। কিন্তু [প্রথম শ্রেণীর] ঐ গভীর জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তি পর্যন্ত তিনি পৌঁছতে পারেন নি।

৩. সাধারণ মানুষ- যে কিছুই জানে না।

প্রথম প্রকার ব্যক্তি শর‘ঈ বিষয় নিয়ে গবেষণা করতে এবং মত পেশ করতে পারেন; বরং কারো বিরোধী হলেও তাঁর উপর দলীল অনুযায়ী বক্তব্য পেশ করা ওয়াজিব। কেননা তিনি তদ্বিষয়ে আদিষ্ট। মহান আল্লাহ বলেন, ‘...তবে তাদের মধ্যে তত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণ ওটা উপলব্ধি করত’।[41] এই শ্রেণীর আলেমগণই কুরআন-সুন্নাহ থেকে হুকুম-আহকাম উদ্‌ঘাটনের অধিকারী- যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল *ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম*-এর বক্তব্য বুঝেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যক্তি- যাকে আল্লাহ জ্ঞান দিয়েছেন কিন্তু তিনি প্রথম শ্রেণী পর্যন্ত পৌঁছতে পারেন নি, তার জন্য কোন দোষ নেই- যদি তিনি সাধারণ বিষয়গুলো এবং তাঁর কাছে যে জ্ঞানটুকু পৌঁছেছে তার অনুসরণ করেন। তবে তাঁকে খুব সতর্ক থাকতে হবে এবং তাঁর চেয়ে বড় আলেমকে জিজ্ঞেস করার ক্ষেত্রে মোটেও শিথিলতা প্রদর্শন করা যাবে না। কেননা তিনি ভুল করতে পারেন এবং তার জ্ঞান সে বিষয় পর্যন্ত নাও পৌঁছতে পারে– যা কোন ‘আম’[42] عام-কে ‘খাছ’ خاص করে দিয়েছে অথবা ‘মুতলাক্ব’[43] مطلق-কে ‘মুক্বাইয়াদ’ مقيد করে দিয়েছে। অথবা

---

[41] . সূরা আন-নিসা ৮৩।

[42] ‘আম’ ও ‘খাছ’-এর আলোচনা গত হয়ে গেছে।

[43] ‘মুতলাক্ব’ مطلق এমন শব্দ- যা একাধিক বস্তুকে শামিল করে, তবে একই সঙ্গে নয়। বরং এটার পরিবর্তে ওটা এই সূত্রে। যেমনঃ যদি বলা হয়, একজন পুরুষ, তাহলে তা সব পুরুষকে শামিল করবে। তবে একই সঙ্গে নয়; বরং একজন একজন করে।

মানসূখ হওয়া কোন বিষয়কে তিনি না জেনে মুহকাম মনে করছেন।

আর তৃতীয় শ্রেণীর ব্যক্তি– যার কোন ইল্‌ম নেই–তার জন্য আলেমগণকে জিজ্ঞেস করা আবশ্যক। আল্লাহ বলেন, ‘অতএব জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস কর, যদি তোমাদের জানা না থাকে’।[44] অন্য আয়াতে এসেছে, ‘অতএব জ্ঞানীদেরকে স্পষ্ট দলীল-প্রমাণসহ জিজ্ঞেস কর, যদি তোমাদের জানা না থাকে’।[45]

সুতরাং এই শ্রেণীর ব্যক্তির দায়িত্ব ও কর্তব্য হল, জিজ্ঞেস করা। কিন্তু সে কাকে জিজ্ঞেস করবে? দেশে অনেক আলেম আছেন এবং সবাই বলছেন যে, তিনি আলেম অথবা সবার সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে, তিনি আলেম! তাহলে কাকে জিজ্ঞেস

‘আম’-এর সাথে ‘মুতলাক্ব’-এর পার্থক্য হল, ‘আম’ একই সঙ্গে একাধিক বস্তুকে শামিল করে।

পবিত্র কুরআন থেকে ‘মুতলাক্ব’-এর একটা **উদাহরণঃ** ‘যিহার’ ظهار-এর কাফফারাহ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, ‘একটা দাসমুক্ত করবে’ [আল-মুজাদালাহ ৩]। কিন্তু এখানে কোন সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করা হয়নি। সুতরাং দাস মুসলিম হোক বা কাফির হোক মুক্ত করলেই চলবে।

‘মুক্বাইয়াদ’ مقيد-এর পরিসর ‘মুতলাক্ব’-এর তুলনায় খানিকটা সংকুচিত। যেমনঃ মহান আল্লাহর বাণী, ‘যে ব্যক্তি কোন মুমিনকে ভুলক্রমে হত্যা করে, সে একজন মুমিন ক্রীতদাস মুক্ত করবে [আন-নিসা ৯২]। এ আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা ভুলবশতঃ হত্যার কাফফারাহস্বরূপ দাসমুক্তির কথা বলেছেন; কিন্তু দাস যেন মুমিন হয় সেই শর্ত জুড়ে দিয়ে দাসের ক্ষেত্রটা সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন।–[অনুবাদক]

[44]. সূরা আল-আম্বিয়া ৭; সূরা আন-নাহ্‌ল ৪৩ ।

[45] . সূরা আন-নাহ্‌ল ৪৩-৪৪।

করবে? আমরা কি বলব যে, যিনি সঠিকতার অধিকতর কাছাকাছি তোমাকে তাঁকে খুজে বের করতে হবে এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করে তাঁর কথা মেনে চলতে হবে? নাকি বলব, যে কাউকে ইচ্ছা তুমি জিজ্ঞেস করতে পার। কেননা নির্দিষ্ট কোন মাসআলায় কোন কোন সময় জ্ঞানে তুলনামূলক নিম্ন স্তরের আলেম তার চেয়ে উপরের স্তরের আলেমের চেয়ে বেশী তওফীকপ্রাপ্ত হতে পারেন?

আলেম সমাজ এ বিষয়ে বিভিন্ন মত দিয়েছেনঃ

কারো মতে, সাধারণ ব্যক্তির উপর তার এলাকার সবচেয়ে বিশ্বস্ত আলেমকে জিজ্ঞেস করা আবশ্যক। কেননা মানুষের শারীরিক অসুস্থতার কারণে যেমন সে সবচেয়ে ভাল ডাক্তার খুঁজে, তেমনি এ ক্ষেত্রেও তা-ই করবে। কারণ জ্ঞান হল মনের ওষুধ। তুমি তোমার অসুখের জন্য যেমন ভাল ডাক্তার নির্ণয় কর, এক্ষেত্রেও তোমাকে ভাল আলেম নির্ণয় করতে হবে। দুটোর মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই।

আবার কেউ কেউ বলেন, তার জন্য এটা আবশ্যক নয়। কেননা ভাল আলেম নির্দিষ্টভাবে প্রত্যকটা মাসআলায় তুলনামূলক নীচের স্তরের আলেমের চেয়ে জ্ঞানী নাও হতে পারেন। সেজন্য দেখা যায়, ছাহাবীগণ *রাযিয়াল্লাহু আনহুম*-এর যুগে মানুষ বেশী জ্ঞানী ছাহাবী থাকা সত্ত্বেও তুলনামূলক কম জ্ঞানী ছাহাবীকে [অনেক সময়] জিজ্ঞেস করতেন।

এ বিষয়ে আমার অভিমত হল, সে দ্বীনদারিতায় ও জ্ঞানে তুলনামূলক উত্তম ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করবে। তবে সেটা তার জন্য ওয়াজিব নয়। কেননা তুলনামূলক বেশী জ্ঞানী ব্যক্তি নির্দিষ্ট ঐ মাসআলায় ভুল করতে পারেন এবং তুলনামূলক কম জ্ঞানী ব্যক্তি সঠিক ফাতাওয়া দিতে পারেন। সুতরাং অগ্রগণ্যতার দিক থেকে সে জ্ঞান, আল্লাহভীতি ও দ্বীনদারিতায় অধিকতর সঠিকতার নিকটবর্তী ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করবে।

পরিশেষে, আমি নিজেকে এবং আমার সমস্ত মুসলিম ভাইকে, বিশেষ করে ছাত্রদেরকে নসিহত করব, যখন কারো কাছে কোন মাসআলা আসবে, তখন সে যেন ভালভাবে না জেনে তড়িঘড়ি করে ফাতাওয়া না দেয়। যাতে আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ না করে বসে। কারণ মুফতী মানুষ এবং আল্লাহর মধ্যে মাধ্যম হিসাবে আল্লাহর শরী'আত প্রচার করে থাকেন। যেমনিভাবে হাদীছে এসেছে- রাসূল *ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম* বলেন, 'আলেমগণ নবীগণের উত্তরাধিকারী'।[46] রাসূল *ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম* আরো বলেন, 'বিচারক তিন শ্রেণীর। তাঁদের এক শ্রেণীর বিচারক কেবল জান্নাতে যাবেন। আর তিনি হচ্ছেন, যিনি হক্ব জেনেছেন এবং তদনুযায়ী রায় দিয়েছেন'।[47]

---

[46] . বুখারী, 'ইলম' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ নং ১০; আবু দাঊদ, 'ইলম' অধ্যায়, হা/৩৬৪১; ইবনু মাজাহ, ভূমিকা, হা/২২৩।

[47] . আবু দাঊদ, 'বিচার' অধ্যায়, হা/৩৫৭৩; ইবনু মাজাহ, 'বিচার' অধ্যায়, হা/২৩১৫।

অনুরূপভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, যখন তোমার কাছে কোন মাসআলা আসবে, তখন তুমি নিজের মনকে আল্লাহর দিকে সোপর্দ করবে এবং তাঁর মুখাপেক্ষী হবে– যাতে তিনি তোমাকে বুঝার ও জানার শক্তি দেন। বিশেষ করে বেশীর ভাগ মানুষের কাছে সুপ্ত থাকে এমন সব গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন বিষয়ে।

আমার কতিপয় উস্তাদ আমাকে বলেছেন, কেউ কোন মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে তার বেশী বেশী ইস্তেগফার করা উচিৎ। মহান আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয় আমি আপনার প্রতি সত্য কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি মানুষের মধ্যে ফয়সালা করেন, যা আল্লাহ আপনাকে হৃদয়ঙ্গম করান। আপনি বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষ থেকে বিতর্ককারী হবেন না এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু'।[48] কেননা ইস্তেগফার পাপের পরিণাম দূর করার বিষয়টা নিশ্চিত করে– যে পাপ ইলম বিস্মৃত হওয়ার এবং মূর্খতার অন্যতম কারণ। মহান আল্লাহ বলেন, 'অতএব, তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের দরুন আমি তাদের উপর অভিসম্পাত করেছি এবং তাদের অন্তরকে কঠোর করে দিয়েছি। তারা কালামকে তার স্থান থেকে বিচ্যুত করে দেয় এবং তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল, তারা তা থেকে উপকার লাভ করার বিষয়টা বিস্মৃত হয়েছে'।[49]

---

[48] . সূরা আন-নিসা ১০৫-১০৬।

[49] . সূরা আল-মায়েদাহ ১৩।

ইমাম শাফেঈ *রহেমাহুল্লাহ* থেকে বর্ণনা করা হয়, তিনি বলেন,

شكوت إلى وكيع سوء حفظي

فأرشدني إلى ترك المعاصي

وقال إعلم بأن العلم نور

ونور الله لا يؤتاه عاصي

অর্থাৎ: 'আমি আমার দুর্বল স্মৃতিশক্তির বিষয়ে ওকী' *রহেমাহুল্লাহ*-কে বললে তিনি আমাকে পাপ কাজ ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশনা দেন এবং বলেন, জেনে রাখ! ইল্ম হচ্ছে আল্লাহর নূর। আর আল্লাহর নূর কোন পাপীকে দেওয়া হয় না'।

অতএব, ইস্তেগফার নিঃসন্দেহে আল্লাহ কর্তৃক মানুষকে জ্ঞানদানের অন্যতম কারণ।

আল্লাহর কাছে আমার নিজের জন্য এবং আপনাদের জন্য তওফীক্ব ও সঠিকতা প্রার্থনা করছি। তিনি আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে কালেমায়ে ত্বাইয়্যেবাহ-এর উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন। হেদায়েত দানের পর তিনি যেন আমাদের অন্তঃকরণকে

বিপথগামী না করেন এবং আমাদেরকে তিনি যেন তার পক্ষ থেকে রহমত দান করেন। নিশ্চয়ই তিনি মহান দাতা।

শুরুতে ও শেষে সবসময় মহান রব্বুল আলামীনের জন্য যাবতীয় প্রশংসা। আল্লাহ আমাদের নবী মুহাম্মাদ *ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম* এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও ছাহাবীবর্গের উপর দরূদ ও সালাম বর্ষণ করুন।

সূচীপত্র